সলিল চৌধুরীর 'আমি' রাগ

অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায়

সলিল চৌধুরীকে প্রথম মুখোমুখি দেখা, অটোগ্রাফ নেওয়া, মঞ্চ থেকে 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ধান দেব মেপে' গানটি শোনানোর সুযোগ যেদিন হয়েছিল, সেটি ছিল ২১/০১/১৯৭৩। আমি তখন স্কুলের ছাত্র। স্থানটি ছিল অবনমহল প্রেক্ষাগৃহের গ্রিনরুম। সময়ের অভাবে সেদিন আমি শুধু গানটির স্থায়ী ও অন্তরা পরিবেশন করার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেই দিন আমার বোঝার বয়সই ছিল না যে, রবি ঠাকুরের 'আসব যাব চিরদিনের সেই আমি' চরণের অর্থ কী (অবশ্য বয়স হয়েছে বলে সব কিছু বুঝি, এমন উদ্ভট দাবি কখনওই করিনি এবং করবও না)। কিন্তু যেদিন পড়লাম, 'সেই আমি'র অন্যতম 'আমি' বলেছেন যে, 'সব থেকে দুরূহ কোন রাগ যদি থেকে থাকে তা হল 'আমি' রাগ'— তখন এক মহান সত্যানুভূতির জগৎকে, দর্শনকে মনটা আবিষ্কার করে ফেলল। নিজেকেই বলে ফেললাম যে, 'শোনো, আমরা যারা চুনোপুঁটিস্য চুনোপুঁটি হয়েও নিজেদের তথাকথিত প্রতিভার অহঙ্কারে গর্ব করে একহাতে কি-বোর্ড বাজিয়ে গান করি অথবা তানপুরা বাঁধতে না-জানা সত্ত্বেও শিক্ষক হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের চোখ রাঙাই, তারা এই আত্মোপলব্ধির সাঙ্গীতিক ব্যাখ্যাকে কখনওই বুঝতে পারব না— যদি না রবীন্দ্রনাথ এবং সলিল চৌধুরী— এই দুই নিরপেক্ষ পাঠভবনে অন্তর দিয়ে প্রবেশ করে তাঁদের শিক্ষাদানকে কৃতজ্ঞচিত্তে আত্মিক করে তোলার জন্য সমাধিস্থ হই।

সলিল চৌধুরীর সৃষ্টি কোনও সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পাঠক্রম নয়, যদিও এই ক্ষেত্রটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। কত গান তিনি রচনা করেছেন, সুর করেছেন, তাঁর সুরারোপিত চলচ্চিত্রের সংখ্যা কত, কারা তাঁর সুরে গান গেয়েছেন, কোন কোন পর্যায়ে তিনি সুর করেছেন, কোন কোন যন্ত্রসঙ্গীতশিল্পী তাঁর রেকর্ডিংয়ে নিয়মিত থাকতেন, তাঁর কবিতা ছড়া প্রবন্ধ নাটক ইত্যাদি কীভাবে আমাদের সমৃদ্ধ করেছে— তা জানার দরকার আছেই। কিন্তু তাঁর এই অসংখ্য সৃষ্টি প্রবহমান মানবজগৎকে কোন চেতনার দিকনির্দেশ করেছে, সেটা না বুঝলে সেই সব সৃষ্টির সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তাকে কীভাবে জুড়ব? সলিল চৌধুরীর 'আমি' রাগ যখন কথায়-সুরে বলে ওঠে, 'দুস্তর পারাবার/ আয় কে হবি রে পার'— তখন সেই রাগ আসলে মন্ত্রই শোনায়... 'আয়রে পরাণ ভাই আয়রে রহিম ভাই/ কালো নদী কে হবি পার'। তিনি যখন বলেন যে, 'ওরে এই নদীর পাকে পাকে কুমির লুকায়ে থাকে/ ভাঙে সুখের ঘর ভাঙে খামার'— তখন তো বলতে শিখতেই হয় 'কুটিলের বাধা যত ঘৃণার নিষ্ঠুরাঘাতে' ভেঙে 'সাম্যের স্বদেশ ভূমি গড়ার শপথ নিয়ে' সেতু বাঁধার কথা। এই 'আমি' সেই বৃহত্তম 'আমি'র কথা, যা অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপস না করার মন্ত্র— যা উপনিষদ, গীতা, বাইবেল, কোরানকে মনে করায়। আমার সন্তানতুল্য মা-বাবাদের বুঝতে হবে যে, সলিল চৌধুরী তাঁর কন্যা অন্তরা চৌধুরীর জন্য যখন 'এই সারাটা দেশ জুড়ে আমার ঘরবাড়ি' গানটি পুজোর গান হিসেবে ১৯৮২ সালে সৃষ্টি করেন, তখন সেই গানের মাধ্যমে তিনি কন্যাকে নিশ্চয়ই শেখাতে চেয়েছিলেন যে, সমগ্র দেশের মানুষকে আপন বলে ভাবতে হয়। কন্যাকে জনপ্রিয় শিল্পী করার জন্য এই সৃষ্টি তিনি করেননি। একই ভাবে যখন অন্তরার জন্য 'ও মাগো মা, অন্য কিছু গল্প বলো' গানটি ১৯৭৭ সালে সৃষ্টি করেন, তখন তিনি আসলে সব শিশু-কিশোরী কন্যার মুখ দিয়েই সেই সব প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'বলোনা কেন ওই ওপাড়ার দাসুর ছেলে/ জ্বরেতে ভুগে, না খেতে পেয়ে মারা গেল?/ এই যে এত সব সারি সারি/ বড় বাড়ি আর এত গাড়ি,/ তবু কেন এত লোক ফুটপাথে শোয়—/ তা বলোনা'... অথবা শেষ স্তবকে ছোট বোন যখন জানতে চায়, 'বলোনা কেন দাদা মেজদা ঘরেতে বেকার?/ ওরা তো দু'জন লেখাপড়ায় ভালোই ছিল'... তখন তো 'আমি' রাগ সুরসমন্বয়, স্বরসঙ্গতির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে সমাজজীবনের ভয়ঙ্কর সত্য। এখানে 'আমি' রাগ সামাজিক দায়বদ্ধ মহানুভব এক আত্মা।

১৯ নভেম্বর ১৯২৫ — ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫

জনপ্রিয় সলিলসঙ্গীত বললেই স্রোতের মতো ভেসে আসে অজস্র গান। সেসব গান পড়তে পারলে, যন্ত্রসঙ্গীতের আয়োজন বুঝতে পারলে তবেই আবিষ্কার করা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ এবং সলিল চৌধুরী দু'জনেই তাঁদের সৃষ্টিতে কোনও ফাঁক রাখেননি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের সম্পূর্ণতার রূপ দিয়েছেন যন্ত্রসঙ্গীতের আয়োজন ছাড়া, আর সলিল চৌধুরী সঙ্গীতায়োজন করে সম্পূর্ণতার অনন্য নজির সৃষ্টি করেছেন। এখানেই বুঝতে হবে গাঁয়ের বধূ, রানার, পালকির গান, ঠিকানা, সেই মেয়ে, অবাক পৃথিবী এবং আরও অনেক অনেক গানের সম্পূর্ণতা।

১৯৭২ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তে সলিল চৌধুরী সৃষ্টি করেন 'এই দেশ এই দেশ/ আমার এই দেশ' গানটি। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে নিয়মিত গানটি সম্প্রচার করা হয়েছিল, যাতে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা শিখে এবং গেয়ে স্বাধীনতা দিবসটি উদ্‌যাপন করতে পারে। আমার বিদ্যালয়ে মহড়া পরিচালনা এবং পরিবেশনের দায়িত্ব আমার ওপর পড়েছিল। সেদিন নিজের অজান্তে শিখেছিলাম যে, 'আমি' রাগ কীভাবে দেশভক্তির কথা বলে। এই প্রসঙ্গেই হিন্দি 'কাবুলিওয়ালা' ছবিতে সলিল চৌধুরী সুরারোপিত 'অ্যায় মেরে পেয়ারে বতন' গানটির কথা মনে পড়ে গেল। গানটি 'আমি' রাগকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছে ভেবেই শিহরিত হয়ে উঠলাম। আসলে 'আমি' রাগই জানায় যে, নীল ধ্রুবতারা দিশাহারা। তাই হয়তো এক হাজার মায়া আর খুচরো খরচ, আশা-প্রত্যাশাকে জীবন থেকে সরিয়ে রেখে পৃথিবীর সেই গাড়িটা থেকে নেমে যেতে হয়, যে গাড়ি 'আমি' রাগের সঙ্গে মানানসই নয়।

জনপ্রিয় সলিলসঙ্গীত বললেই স্রোতের মতো ভেসে আসে অজস্র গান। সেসব গান পড়তে পারলে, যন্ত্রসঙ্গীতের আয়োজন বুঝতে পারলে তবেই আবিষ্কার করা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ এবং সলিল চৌধুরী দু'জনেই তাঁদের সৃষ্টিতে কোনও ফাঁক রাখেননি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের সম্পূর্ণতার রূপ দিয়েছেন যন্ত্রসঙ্গীতের আয়োজন ছাড়া, আর সলিল চৌধুরী সঙ্গীতায়োজন করে সম্পূর্ণতার অনন্য নজির সৃষ্টি করেছেন। এখানেই বুঝতে হবে গাঁয়ের বধূ, রানার, পালকির গান, ঠিকানা, সেই মেয়ে, অবাক পৃথিবী এবং আরও অনেক অনেক গানের সম্পূর্ণতা।

সলিল চৌধুরীর কবিতা পড়তে পড়তে মনে হয়েছে যে, এই কবিতা পড়ার রীতির স্বরলিপি তো কবি করে যাননি। তবে কি এই কবিতাগুলোকে 'আমি' রাগের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না? আমার বোধ বলছে, যাবে। কারণ, সলিলকবির কবিতার নাম যেখানে, আমি, আমার বয়স, কোথায় সে গান, একগুচ্ছ চাবি, আমি কবি নই, আমি খালেদের মা বলছি, বা মহাকাব্যের দলিল ইত্যাদি— সবই সেই দীপক রাগের মতো অগ্নিস্নান করায়, জীবন হয়ে ওঠে সৎ তেজস্বিতায় উদ্দীপ্ত। তাঁর লেখা ও মঞ্চস্থ হওয়া বহু নাটকও সেই মানুষের জয়গান গাইবার কথা বলেছে। সেও সেই 'আমি' রাগ। 'আমি' রাগ শব্দের ব্যাখ্যা দিয়ে সলিল চৌধুরী বলেছেন, 'আমার ব্যক্তিগত ধারণা, প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক মানুষ হচ্ছে সমুদ্রের মতো— শত শত ভাব অনুভূতি, ঘটনার নদীপ্রবাহ তাতে এসে মিলিত হয়ে তাকে অনন্য বা unique করে তোলে। তার ফলেই সে হয় অত্যন্ত মিশ্রিত এবং জটিল এক 'রাগ'। এবং সেই কারণেই প্রত্যেকটি 'আমি' রাগই আবার আলাদা।... যদি অনেকগুলি সুরকে অর্কেস্ট্রার মতন করে একসঙ্গে বাজিয়ে 'পলিফোনি' করা যেত, ভারী সুবিধে হত। আমার এই রচনার নাম দিতাম— Symphony in 'I' Major। কিন্তু তা হবার নয়।'

আজ সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষে তাই প্রশ্ন জাগে, আমরা এই সাধক পথিককে কতটা বুঝি? তাঁর গান দিয়ে জীবনকে কতটা খুঁজি? সত্যিই কি তাঁর সৃষ্টিকে বুঝি? জানি না।

লেখক বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ও সঙ্গীত প্রশিক্ষক